প্রাকৃতিক ভূগোল
(Physical Geography)

ইউনিট ৩

ভূমিকা

প্রাকৃতিক ভূগোল হলো জ্ঞানের সেই শাখা, যা পৃথিবীর সকল **প্রাকৃতিক** উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণ করে। ভূগোলের যে শাখা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন **প্রাকৃতিক** উপাদানসমূহ যেমন : নদ-নদী,পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি উপাদানসমূহের গঠন ও রূপান্তর প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে **প্রাকৃতিক** ভূগোল বলে। এই ইউনিটে আমরা **প্রাকৃতিক** ভূগোলের অন্যতম উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করব।

পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -৩.১ : ভূ-ত্বক ও ভূ-অভ্যন্তরের গঠন
পাঠ -৩.২ : শিলা ও খনিজ
পাঠ -৩.৩ : ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ
পাঠ -৩.৪ : ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ
পাঠ -৩.৫ : ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ
পাঠ -৩.৬ : পর্বত
পাঠ -৩.৭ : মালভূমি
পাঠ -৩.৮ : সমভূমি

পাঠ-৩.১ ভূ-ত্বক ও ভূ-অভ্যন্তরের গঠন
(Structure of the Earth's Crust & Earth's Interior)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-ত্বক ও এর গঠনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভূ-অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- ভূ-অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তর সমূহের গঠন প্রণালি ও বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ভূ-ত্বক, শিলামন্ডল, গড় পুরুত্ব, অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল, সিয়াল, সিমা, শিলামন্ডল, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, ভূমিরূপ প্রক্রিয়া।

ভূ-ত্বক ও এর গঠনকারী উপাদানসমূহ

সৃষ্টির আদি অবস্থায় পৃথিবী একটি জ্বলন্ত বাষ্পীয় অগ্নিপিন্ড ছিল। কোটি কোটি বছর যাবৎ ঘূর্ণনরত এই জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিন্ড ক্রমশ তাপ বিকিরণ করে শীতল ও সংকুচিত হতে থাকে এবং গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে পৃথিবীর গঠনকারী ভারী উপাদানসমূহ পৃথিবীর কেন্দ্র ভাগে সঞ্চিত হতে থাকে। অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদানসমূহ উপরের দিকে স্তরীভূত হয়ে জমাট বাঁধতে থাকে। ক্রমশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর জমাট বেঁধে কঠিনাকার ধারণ করে যা ভূ-ত্বক হিসেবে পরিচিত।

ভূ-ত্বক গঠনকারী উপাদানসমূহ

পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা বাইরে শিলা দ্বারা গঠিত যে কঠিন বহিরাবরণ রয়েছে, তাকে ভূ-ত্বক বলা হয়। ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ২০ কিলোমিটার। মহাদেশের উঁচু পর্বত চূড়া হতে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পুরুত্ব সবচেয়ে বেশি (গড় পুরুত্ব ৩৫ কিলোমিটার)। অপরদিকে সমুদ্র তলদেশে এর গড় পুরুত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার (চিত্র ৩.১.১)।

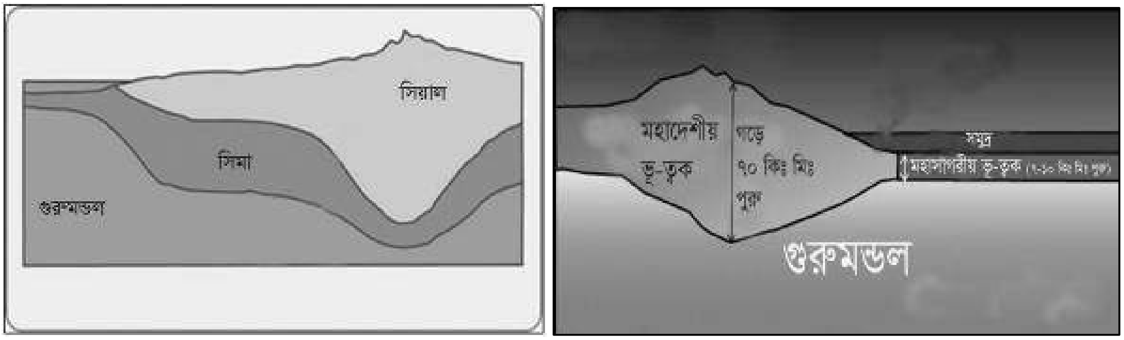

চিত্র ৩.১.১: মহাদেশীয় ভূ-ত্বক (সিয়াল স্তর) ও মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক (সিমা স্তর)

মহাদেশের তলদেশের ভূ-ত্বক মহাদেশীয় ভূ-ত্বক ও মহাসাগরের তলদেশের ভূ-ত্বক মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক নামে পরিচিত। মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়ামের (AL) প্রাধান্য থাকায় এই স্তরকে সিয়াল স্তর (Sial) নামে অভিহিত করা হয়। সিয়াল স্তরের নীচের অংশ অপেক্ষকৃত ভারী স্তরটি নাম সিমা (Sima) স্তর। এই স্তরটি সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ স্তর। ভূ-ত্বক গঠনকারী উপাদানসমূহের মধ্যে মোট ১৫টি

উপাদান দ্বারা ভূ-ত্বকের শতকরা ৯৯ ভাগের অধিক অংশ গঠিত। এই উপাদান সমূহের মধ্যে প্রধান ৮টি হলো- অক্সিজেন, সিলিকন, এ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ ভূ-ত্বক গঠনকারী মোট ১০৫টি মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করেছেন।

ভূ-অভ্যন্তরীন গঠন (Internal Structure of the Earth)

সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড ছিল। ক্রমাগত ঘূর্ণনরত এই বাষ্পীয় অগ্নিপিন্ড তাপ বিকিরন করে শীতল ও সঙ্কুচিত হয়ে কঠিনাকার ধারণ করতে থাকে। এভাবে কঠিন হয়ে গোলাকৃতি হবার সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ঘনত্বে ভারী পদার্থ সমূহ পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে সঞ্চিত হয়। কম ঘনত্বের পদার্থসমূহ উপরের দিকে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা হালকা বা কম ঘনত্বের পদার্থ সমূহ পৃথিবীর বাইরের দিকের আবরন সৃষ্টি করে। এভাবে,পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কেন্দ্রের দিকে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রনে তিনটি প্রধান মন্ডলের বা স্তরের সৃষ্টি হয়।এই মন্ডল তিনটি নিম্নরূপ-

ক. অশ্মমন্ডল (Lithosphere) ও ভূ-ত্বক (Earth`s Crust)

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রায় ৬০ থেকে ১০০ কিঃ মিঃ গভীর পর্যন্ত কঠিন স্তরটিকে অশ্মমন্ডল বলা হয়। অশ্মমন্ডলের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর অর্থাৎ যে স্তরটির উপর আমরা বসবাস করি, তাকে ভূ-ত্বক বলা হয়।

ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ২০ কিলোমিটার, মহাদেশীয় ভূ-ত্বক গড়ে ৩৫ কিঃমিঃ এবং মহাসাগরীয় ভূত্বক গড়ে মাত্র ৫ কি.মি. পুরু। মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের প্রধান গাঠনিক উপাদান সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (AL) হওয়ায় এই স্তরকে সিয়াল স্তর (Sial) বলা হয়। অপরদিকে, মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের প্রধান গাঠনিক উপাদান সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Ma) হওয়ায় এই স্তরকে সিমা স্তর (Sima) নামে অভিহিত করা হয় (চিত্র ৩.১.২)।

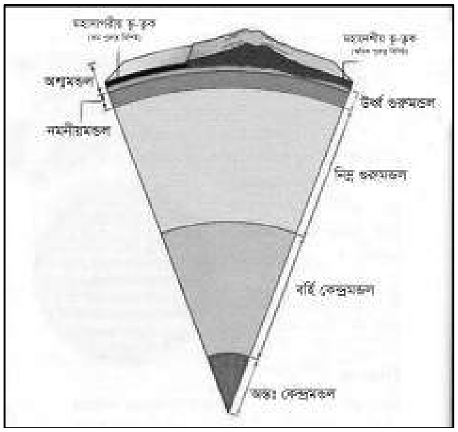

চিত্র ৩.১.২ : অশ্মমন্ডলের উর্ধ্ব ও নিম্ন স্তর

খ. গুরুমন্ডল (Mantle)

অশ্মমন্ডলের অব্যবহিত পর থেকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রায় ২,৮৮৫ কি.মি. পর্যন্ত পুরুত্ব বিশিষ্ট স্তরটিকে গুরুমন্ডল বলে। এই স্তরটির গাঠনিক উপাদানগুলো হলো-সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। অত্যধিক তাপ ও চাপে এই মন্ডলের উপাদানগুলো কঠিন ও তরলের মাঝামাঝি আঠালো অবস্থায় রয়েছে।

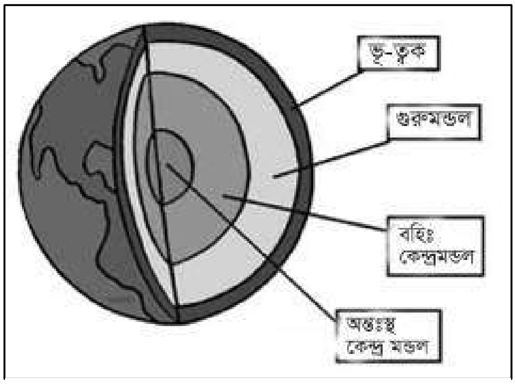

চিত্র ৩.১.৩ : **গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল**

গুরুমন্ডলের প্রধান স্তর দুইটি হলো- (ক) লোহা ও ম্যাগনেসিয়ামসমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা তৈরি উর্ধ্ব গুরুমন্ডল (৭০০ কি.মি. বিস্তৃত) এবং (খ) আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও সিলিকন অক্সাইড সমৃদ্ধ নিম্ন গুরুমন্ডল (চিত্র ৩.১.৩) ।

গ. কেন্দ্রমন্ডল (Core)

গুরুমন্ডলের অব্যবহিত পর থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটির নাম কেন্দ্রমন্ডল। এই স্তরটির পুরুত্ব প্রায় ৩,৪৮৬ কি.মি.। ভূ-কম্পন তরঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে, কেন্দ্রমন্ডলের বাইরের অংশ অপেক্ষাকৃত তরলাকারে রয়েছে (২,২৭০ কি.মি. পুরু)। লোহা ও নিকেল সমৃদ্ধ এই মন্ডলের গাঠনিক উপাদানের মধ্যে পারদ ও সিসা উল্লেখযোগ্য। নিকেল (Ni) ও লোহার(Fe) প্রাধান্য থাকায় এই স্তরটির নিফে (Nife) স্তর নামে অভিহিত করা হয়।

🛠	**শিক্ষার্থীর কাজ**	ভূ-অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তর সমূহের চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ :

ভূ-মন্ডলের গাঠনিক উপাদানসমূহের ঘনত্ব ও বিন্যাসের ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগকে প্রধান তিনটি মন্ডলে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো- অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল। অশ্মমন্ডলের উপরিস্তর ভূ-ত্বক নামে অভিহিত। বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্বারা গঠিত ভূমন্ডলের প্রধান গাঠনিক উপাদানগুলো হলো- সিলিকন, নিকেল, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি। অশ্মমন্ডল কঠিন ও শীতল হলেও গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল ক্রমান্বয়ে অধিকতর আঠালো, ঘন ও উত্তপ্ত বলে বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব কত কিলোমিটার?
(ক) ১০ কিঃ মিঃ (খ) ২০ কিঃ মিঃ
(গ) ৩০ কিঃ মিঃ (ঘ) ৪০ কিঃ মিঃ

২. মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের গাঠনিক উপাদানের মধ্যে কোন উপাদানের প্রাধান্য বেশি?
ক) সিলিকন (খ) ম্যাগনেশিয়াম
(গ) অক্সিজেন (ঘ) পটাসিয়াম

৩. নিচের চিত্রটি শূণ্যস্থান গুলো পূরণ করুন।

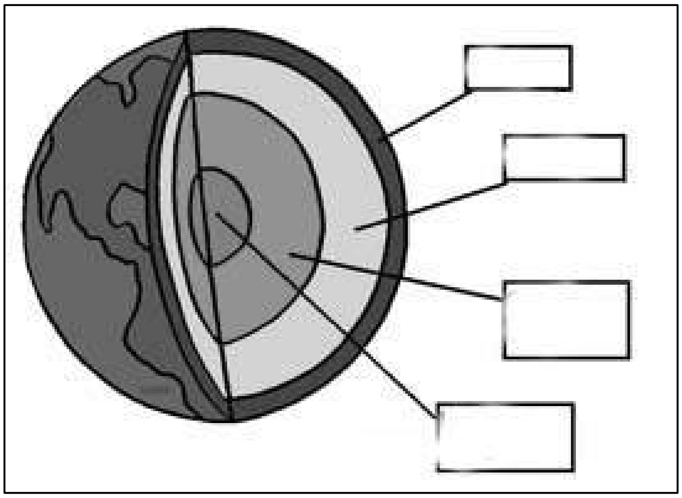

৪. ভূ-অভ্যন্তরস্থ কোন স্তরটি অত্যাধিক তাপ ও চাপে আঠালো অবস্থায় রয়েছে?
(ক) অশ্ম মন্ডল (খ) গুরুমন্ডল
(গ) অন্তঃস্থ কেন্দ্র মন্ডল (ঘ) বহিঃ কেন্দ্রমন্ডল

৫. ভূ-ত্বকের সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ স্তরটির অপর নামটি কী?
(ক) সিয়াল (খ) সিমা
(গ) নিফে (ঘ) মোহো বিচ্ছিন্নতা

পাঠ-৩.২ শিলা ও খনিজ (Rocks & Minerals)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিলা ও খনিজ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিলা ও খনিজের পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- শিলার প্রকারভেদ ও বিভিন্ন প্রকার শিলা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	শিলা , আগ্নেয়শিলা, পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা, খনিজ, সমসত্ত্ব ও ম্যাগমা।

শিলা

ভূ-ত্বক গঠনকারী সকল উপাদানকে শিলা বলা হয়। শিলা নরম ও কঠিন দুই প্রকারই হতে পারে। যথা- কাদা হলো নরম শিলা ও মার্বেল পাথর শক্ত ধরনের শিলা।

খনিজ (Minerals)

খনিজ হলো প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ, যার সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। যথাঃ কোয়ার্টজ, ফেলসপার, হীরা, সোনা, পারদ, গন্ধক ইত্যাদি। একাধিক খনিজের সংমিশ্রনে শিলা গঠিত হয়ে থাকে।

শিলা ও খনিজের পার্থক্য

খনিজ	শিলা
১. এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।	১. এক বা একাধিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।
২. খনিজ সমসত্ত্ব অজৈব পদার্থ।	২. শিলা অসমসত্ত্ব জৈব পদার্থ।
৩. খনিজ কঠিন ও স্ফটিকাকার হয়।	৩. শিলা নরম ও কঠিন দুই প্রকার। তবে স্ফটিকাকার নয়।
৪. খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত আছে।	৪. শিলার কোনো রাসায়নিক সংকেত নেই।
৫. খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের ধর্মের অনুরূপ।	৫. শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শিলার প্রকারভেদ ও বিভিন্ন প্রকার শিলাসমূহের বর্ণনা : ভূ-ত্বক গঠনকারী সকল শিলাসমূহকে গঠন প্রণালির ভিত্তিতে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক. আগ্নেয়শিলা (Igneous Rocks)

পৃথিবী জ্বলন্ত অবস্থা থেকে শীতল হবার সময়ে অর্ধগলিত বিভিন্ন খনিজ অত্যন্ত দ্রুত শীতল ও কঠিনাকার ধারণ করে। এইরূপে সৃষ্ট কঠিন পদার্থগুলো আগ্নেয়শিলা নামে অভিহিত। আবার ভূমিকম্পের বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত অর্ধগলিত ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে। ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে এলে, তাকে লাভা বলে। লাভা শীতল হয়ে জমাট বেঁধে আগ্নেয়শিলার সৃষ্টি হয়। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে এই শিলার সৃষ্টি হওয়ায় একে **প্রাথমিক শিলা বা আদি শিলা (Primary Rock)** বলা হয়। যেমন- ব্যাসল্ট, গ্র্যানাইট ইত্যাদি।

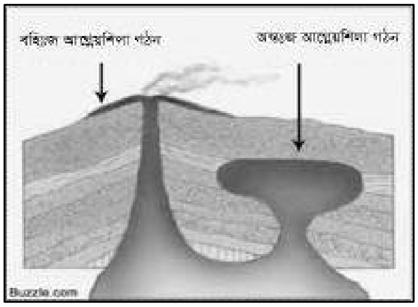

চিত্র ৩.২.১: **বহিঃজ ও অন্তঃজ** আগ্নেয়শিলা

আগ্নেয়শিলার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। আগ্নেয়শিলার স্তর নেই অর্থাৎ অস্তরীভূত শিলা;
২। আগ্নেয়শিলায় কোনো জীবাশ্ম নেই;
৩। আগ্নেয়শিলা অপ্রবেশ্য;
৪। আগ্নেয়শিলা সুদৃঢ় ও সুসংহত।

আগ্নেয়শিলার প্রকারভেদঃ

(ক) বহিঃজ আগ্নেয়শিলা (Extrusive Igneous Rocks)

ভূ-গর্ভস্থ ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বা অন্য কোনো কারণে ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে এসে শীতল ও জমাট বাঁধলে তাকে বহিঃজ আগ্নেয়শিলা বলে।

ব্যাসল্ট, রায়োলাইট, অ্যান্ডিসাইট এই ধরনের আগ্নেয় শিলা (চিত্রঃ ৩.২.১)।

অন্তঃজ আগ্নেয়শিলা (Intrusive Igneous Rocks)

ম্যাগমা ভূ-গর্ভে জমাট বেঁধে স্থুল, দানাদার ও হালকা বর্ণের যে আগ্নেয় শিলা তৈরি হয়, তাকে অন্তঃজ আগ্নেয়শিলা বলা হয়। গ্র্যানাইট, গ্র্যাবো, ল্যাকোলিথ ইত্যাদি এ ধরনের অন্তঃজ আগ্নেয়শিলা।

খ. পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

বৃষ্টি, বায়ু, তুষার, তাপ, সামুদ্রিক ঢেউ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ দ্বারা আগ্নেয়শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণী হয়। এই বিচূর্ণীত আগ্নেয়শিলাসমূহ বায়ুপ্রবাহ নদী প্রবাহ, হিমবাহ,সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি দ্বারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাহিত ও অপসারিত হয়। এই বাহিত শিলা কণা সমূহ ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নীচু স্থান যেমন হ্রদ বা সমুদ্র তলদেশে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হতে থাকে। বহু বছর ধরে এভাবে সঞ্চিত শিলারাশির উপরের স্তরগুলোর চাপে নিম্নের স্তরগুলো জমাট বেঁধে নতুন এক ধরনের শিলা গঠিত হয় যা পাললিক শিলা নামে পরিচিত। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হবার কারণে একে স্তরীভূত শিলা (Stratified Rocks) নামেও অভিহিত করা হয়। আবার, হ্রদ বা সাগরের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হবার সময়ে জলজ জন্তুর দেহাবশেষ, উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি চাপা পড়ে। প্রচন্ড চাপে এই সমস্ত প্রাণি ও উদ্ভিজ্জ কঠিনাকার ধারণ করে জীবাশ্ম (Fossil) তৈরি করে। পাললিক শিলাতেই কেবলমাত্র এই জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় (চিত্র ৩.২.২)।

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য

১। পাললিক শিলা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়;
২। পাললিক শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায়;
৩। পাললিক শিলা স্ফটিকাকার নয়;
৪। পাললিকা শিলা হালকা, ভঙ্গুর ও তরঙ্গ বিশিষ্ট।

পাললিক শিলার প্রকারসমূহ

গঠন প্রণালী অনুসারে পাললিক শিলা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-

চিত্র ৩.২.২ ঃ পাললিক শিলা

ক. যান্ত্রিক উপায়ে, অর্থাৎ বায়ু, নদী, সামুদ্রিক ঢেউ ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত আগ্নেয় শিলা বাহিত হয়ে এবং নীচু স্থানে সঞ্চিত হয়ে, জমাট বেঁধে যান্ত্রিক উপায়ে পাললিক শিলা গঠিত হয়। যেমনঃ কংগ্লোমারেট, বেলে পাথর, শেল ইত্যাদি।

খ. জৈবিক উপায়ে, অর্থাৎ শিলা স্তরে চাপা পড়া বিভিন্ন প্রাণি ও উদ্ভিজ্জের দেহাবশেষ কঠিনকার ধারণ করে জৈবিক উপায়ে পাললিক শিলা গঠন করে। যেমনঃ লীগনাইট, বিটুমিনাস ইত্যাদি।

গ. রাসায়নিক উপায়ে, অর্থাৎ বৃষ্টি ও নদীর পানির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত আগ্নেয়শিলা জমাট বেঁধে রাসায়নিক উপায়ে পাললিক শিলা গঠিত হয়। যেমনঃ জিপসাম, ডলোমাইট ইত্যাদি (চিত্র ৩.২.৩ ঃ রূপান্তরিত শিলা)।

চিত্র ৩.২.৩ : রূপান্তরিত শিলা

(গ) রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)

ভূ-আন্দোলন, অগ্নুৎপাত , ভূমিকম্পসহ অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা অত্যধিক তাপ ও চাপে পরিবর্তত হয়ে এক নতুন ধরনের শিলার সৃষ্টি করে, যাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন– কাদা রূপান্তরিত হয়ে স্লেট, গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে নিসে পরিণত হয়।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। রূপান্তরিত শিলা স্ফটিক যুক্ত;
২। এই শিলা অত্যন্ত কঠিন;
৩। এই শিলায় জীবাশ্ম নেই;
৪। কোন কোন রূপান্তরিত শিলায় ঢেউ খেলানো স্তর দেখা যায়।

রূপান্তরিত শিলার প্রকারভেদ

উৎস্য ও গঠন প্রণালি অনুসারে রূপান্তরিত শিলা দুই প্রকার। যথা-

ক. আগ্নেয়শিলা প্রচন্ড তাপে ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে আগ্নেয় শিলা থেকে রূপান্তরিত শিলা তৈরি হয়। যেমন: গ্রানাইট থেকে নিস (Gneiss) তৈরি হয়।

খ. পাললিক শিলা প্রচন্ড তাপে ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে, পাললিক শিলা থেকে রূপান্তরিত শিলা তৈরি হয়। যেমন: বেলেপাথর থেকে কোয়ার্টজাইট (Quartzite) তৈরি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলার মধ্যকার পার্থক্য সমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ :

ভূ-পৃষ্ঠ গঠনকারী শিলাসমূহ নানা ধরনের খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। শিলাসমূহ তিন ধরনের। ক. আগ্নেয়শিলা, খ.পাললিক শিলা ও গ.রূপান্তরিত শিলা। কঠিন, অস্তরীভূত ও জীবাশ্মবিহীন আগ্নেয়শিলা পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। আগ্নেয়শিলা নদী, বায়ু, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত, অপসারিত ও নীচু ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে, জমাট বেঁধে যে স্তরীভূত শিলার সৃষ্টি করে তাকে পাললিক শিলা বলে। আগ্নেয় ও পাললিক শিলা অত্যধিক তাপ ও চাপে রূপান্তরিত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে এক নতুন শিলায় পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. একাধিক খনিজ পর্দাথের সমন্বয়ে কোনটি তৈরি হয়?
(ক) শিলা (খ) পানি
(গ) বায়ু (ঘ) উদ্ভিজ্জ

২. কোন ধরনের শিলায় স্তর নেই?
(ক) আগ্নেয় শিলায় (খ) পাললিক শিলায়
(গ) রূপান্তরিত শিলায় (ঘ) বিচূর্ণীত শিলায়

৩. শিলাস্তরের মাঝে প্রচন্ড তাপ ও চাপে কঠিনাকার ধারণকৃত প্রাণি ও উদ্ভিদের দেহাবশেষকে কী বলা হয়?
(ক) জীবাশ্ম (খ) খনিজ
(গ) স্ফটিক (ঘ) ধাতু

৪. আগ্নেয় ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে কোন শিলা সৃষ্টি হয়?
(ক) আদি শিলা (খ) স্তরীভূত শিলা
(গ) রূপান্তরিত শিলা (ঘ) অস্তরীভূত শিলা

৫. কোন ধরনের ভূ-গর্ভস্থ পদার্থ জমাট বেঁধে আগ্নেয়শিলা সৃষ্টি হয়?
(ক) পানি (খ) বালু
(গ) ম্যাগমা (ঘ) ভস্ম

পাঠ-৩.৩ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ (Diastrophism on the Earth Crust)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- ভূ- আলোড়ন প্রক্রিয়া কত প্রকার এবং
- ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	আকস্মিক পরিবর্তন,ধীর পরিবর্তন, বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবন,ক্ষয়ীভবন,অবক্ষেপন।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া বা ভূ-প্রক্রিয়া বলতে নানা প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপে অনবরত নানা রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়। প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ভূ-আন্দোলন ও ভূ-আলোড়ন নামেও অভিহিত করা হয়। ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপ শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সৌর শক্তির সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়ে চলেছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্রই ধীরে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অথবা আকস্মিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। নিম্নে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধনকারী ভূ-প্রক্রিয়াসমূহের একটি ছক দেয়া হলো।

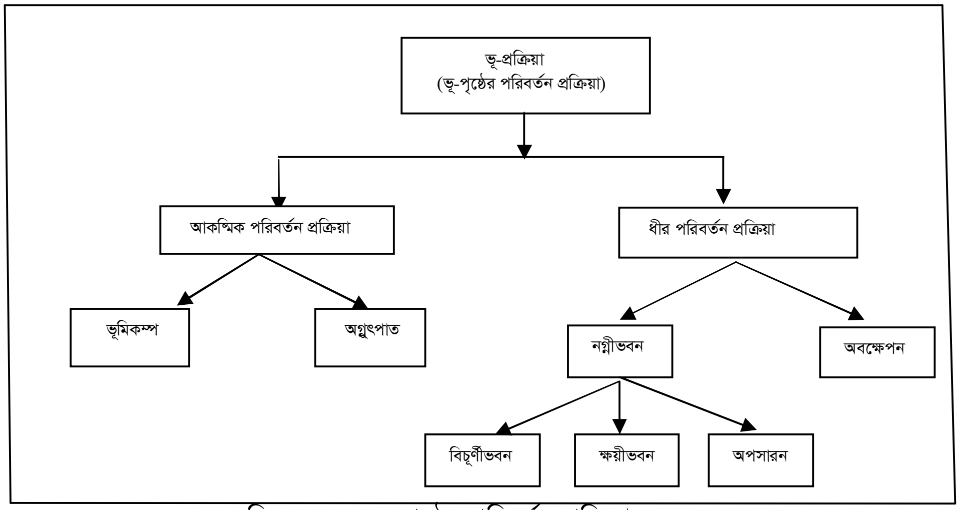

চিত্র ৩.৩.১ঃ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া সমূহ

আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ (Sudden Changes) : ভূ-গর্ভস্থ গলিত ম্যাগমাসমূহ ভূ-গর্ভে তাপ ও চাপের তারতম্য এবং অন্যান্য ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির প্রভাবে প্রচন্ড আলোড়িত সৃষ্টি হয়। এইরূপ আকস্মিক আলোড়নের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত , ভূ-কম্পন, ভূ-অভ্যন্তরে সংকোচন ও প্রসারন ইত্যাদি নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে, স্বল্প সময়ের জন্য, অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিস্তৃত স্থান জুড়ে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া বলা হয়। অগ্নুৎপাত , ভূমিকম্প, সুনামী ইত্যাদি আকস্মিক পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়া।

ধীর পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ (Slow Changes) : সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘ সময় জুড়ে ভূমিরূপের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে ধীর পরিবর্তন বলা হয়। যেমনঃ পর্বত, সমভূমি, ব-দ্বীপ ইত্যাদি দীর্ঘ সময় ব্যাপী বিশাল অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয়।ধীর পরিবর্তন মূলতঃ দুইভাবে কাজ করে। যেমন: (ক) নগ্নীভবন ও (খ) অবক্ষেপন

ক) নগ্নীভবন : নগ্নীভবন আবার দুইটি ধাপে কাজ করে। যেমন:

১) বিচূর্ণীভবন : কোনো স্থানের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ ঐ স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-ত্বকের শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে বিচূর্ণীভবন বলা হয়। বিচূর্ণীভবনকে

'আবহবিকার' নামেও অভিহিত করা হয়। যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক উপায়ে বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হয় (চিত্র ৩.৩.২)।

২) ক্ষয়ীভবন : বিচূর্ণীভবনের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণীত শিলারাশি বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত দ্বারা ঐ স্থান থেকে অন্যত্র অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্ষয়ীভবন বলা হয়। অর্থাৎ ক্ষয়ীভবন মূলত বিচূর্ণীভবন ও অপসারণ প্রক্রিয়ার মিলিত রূপ।

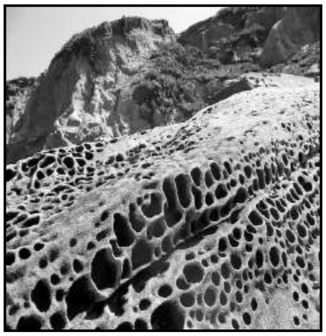

চিত্র ৩.৩.২: যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক উপায়ে বিচূর্ণীভবন

অবক্ষেপন : নদী, হ্রদ ও সমুদ্র তলদেশে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখন্ডসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে বাহিত হয়ে অবক্ষেপিত হয়। এইভাবে যুগের পর যুগ অবক্ষেপিত শিলাখন্ডসমূহ জমাট বেঁধে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ তৈরি হয়। যেমন: ব-দ্বীপ, লোয়েস সমভূমি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ছকটি অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ :

প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের নানা পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ভূ-আন্দোলন বা ভূ-আলোড়ন নামে অভিহিত করা হয়। ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপ শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সৌর শক্তির সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়ে চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপে অনবরত পরিবর্তনকে কী বলা হয়?
(ক) ভূ-প্রক্রিয়া (খ) রূপান্তর প্রক্রিয়া (গ) নগ্নীভবন (ঘ) ভূমিকম্প

২। নিচের কোনটি আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
(ক) ভূমিকম্প (খ) জলোচ্ছ্বাস
(গ) ঘূর্ণিঝড় (ঘ) বিচূর্ণীভবন

৩। বিচূর্ণীভবনের অপর নাম কী?
(ক) আবহ বিকার (খ) নগ্নীভবন (গ) অবক্ষেপন (ঘ) বহন

৪। বিচূর্ণীভবন ও অপসারণ প্রক্রিয়ার মিলিত রূপ কোনটি?
ক) ভূ-আন্দোলন (খ) সুনামি (গ) ধীর পরিবর্তন (ঘ) ক্ষয়ীভবন

৫। ব-দ্বীপ কী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ?
(ক) ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়ায় (খ) অবক্ষেপন প্রক্রিয়ায় (গ) নগ্নীভবন (ঘ) রূপান্তর প্রক্রিয়ায়

পাঠ-৩.৪ ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

(Sudden Changes on the Earth)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ভূমিকম্প,সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরি, সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, মৃত আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাত , লাভা, ম্যাগমা, আগ্নেয় গ্রীবা, জ্বালামুখ, আগ্নেয়হ্রদ।

ভূমিকম্প

ভূ-আলোড়নের সময়ে অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের একটি অংশ যখন হঠাৎ কিছুক্ষনের জন্য কেঁপে উঠে, তখন ভূ-ত্বকের এই কম্পনকে **ভূমিকম্প** বলা হয়। ভূ-গর্ভস্থ যে স্থানে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্পের **উৎস স্থল বা কম্পকেন্দ্র** বলা হয়। কম্পকেন্দ্র বরাবর লম্বভাবে ভূ-পৃষ্ঠের যে বিন্দুটি রয়েছে,তাকে **উপকেন্দ্র** বলা হয়। সাধারণতঃ ভূ-ত্বকের ৩২ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ভূমিকম্পের উৎস স্থান থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে গভীরতা আরও বেশী হতে পারে। কম্পকেন্দ্র থেকে ভূমিকম্প চারিদিকে ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ৩.৪.১)। ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়ে থাকে। ভূমিকম্প মাপন যন্ত্রের নাম **সিসমোমিটার**। ভূমিকম্পনের রেখা যে কাগজে অংকিত হয়, তাকে সিসমোগ্রাফ বলে (চিত্র ৩.৪.২)।

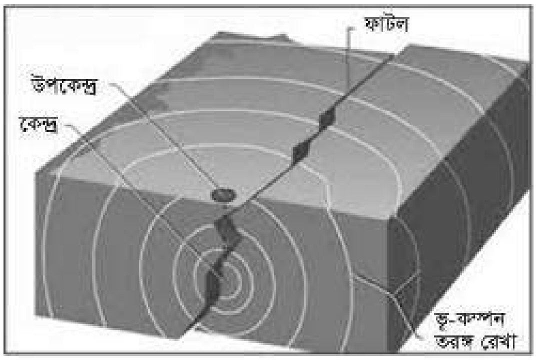

চিত্র ৩.৪.১ ঃ ভূমিকম্পের কম্পকেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও তরঙ্গাকার কম্পন ঢেউসমূহ

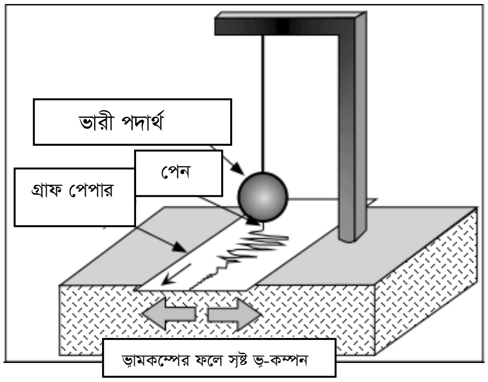

চিত্র ৩.৪.২ ঃ সিসমোমিটার

ভূমিকম্পের কারণসমূহ

১. ভূ-ত্বক কতকগুলো প্লেট দ্বারা গঠিত। এই প্লেটসমূহ বিভিন্ন দিকে, যেমন: একে অপরের বিপরীত দিকে, একে অপরের অভিমুখে এবং পরস্পর সমান্তরাল ভাবে সঞ্চালিত হয়। এইরূপ সঞ্চালনের ফলে সৃষ্ট চাপ থেকে আকষ্মিক ভাবে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠে এই কম্পন ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে (চিত্র ৩.৪.৩)

২. ভূ-গর্ভস্থ তাপের ফলে বিপুল পরিমান বাষ্প সৃষ্টি হলে, ঐ বাষ্প ভূ-ত্বকের নীচের অংশে প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

৩. ভূ-ত্বকের বিভিন্ন অংশে তাপ বিকিরণের ফলে সংকুচিত হলে সংলগ্ন এলাকার ভূ-ত্বকের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে ভূ-অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিলারাশির মধ্যে টান সৃষ্টির হয়। ফলে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৪. অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে ঐ এলাকা কেঁপে উঠে ভূমিকম্প হয়।

অন্যান্য আরও কতিপয় কারণ যেমন: ভূ-গর্ভস্থ চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, শিলাচ্যুতি, ভূমিধ্বস, হিমবাহের চলাচল ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে।

চিত্র ৩.৪.৩ ঃ ভূ-ত্বক কতকগুলো প্লেটসমূহের তিনমুখী চলাচল

ভূমিকম্পের ফলাফল

ভূমিকম্পের ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ে ভূ-ত্বকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৫৫৬ সালে চীনের সেনসাই এলাকায় ব্যাপক ভূমিকম্পের ফলে ৮,৩০,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৮৭ সালে ভারতের আসামে তীব্র ভূমিকম্পের ফলে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে নদীটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ২০০৪ সালে ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমাংশে ৯.১ রিখটার স্কেলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এই ভূমিকম্প ও পরবর্তী সুনামি এর আঘাতে ১,৩১,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। সম্প্রতি ২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ সময়ে দুপুর ১২.১১ মিনিটে নেপালে ৭.৮ রিখটার স্কেলের এক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়,যার ফলে প্রায় ৪০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন (চিত্র ৩.৪.৪)। জাপানে প্রতি বছর প্রায় ৭ হাজার ছোট-বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.৪.৪ : নেপাল ভূমিকম্প, ২০১৫

ভূমিকম্পের ফলে ভূ-ত্বকে যে পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ-

১. শিলাচ্যুতি ও ফাটল সৃষ্টি,
২. শিলাস্তরে নানা প্রকার ভাঁজ সৃষ্টি,
৩. ভূ-ভাগের উত্থান অথবা পতন হয়ে নদী-খাত পরিবর্তন, পাহাড়-পর্বত ও দ্বীপের সৃষ্টি,
৪. উচ্চভূমি ধ্বসে-নিম্ন জলাশয়ের সৃষ্টি,
৫. পর্বতের উপরিভাগ থেকে হিমানী সম্প্রপাত ও শিলাপাত এবং
৬. সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক আকারে সামুদ্রিক ঢেউ সৃষ্টি বা সমুদ্র উপকূলে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি। এরূপ জলোচ্ছ্বাস **সুনামী** নামে অভিহিত।

সুনামী (Tsunami)

সুনামী এটি জাপানী শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ' (Harbour wave)। সমুদ্র বা বৃহদাকার হ্রদের তলদেশে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণ ও পারমানবিক বা অন্য কোনো কারণে বিস্ফোরনের ফলে উঁচু ও বিশালাকার ঢেউ উপকূলে আঘাত হানে। এই ঢেউগুলো **সুনামী** নামে পরিচিত।

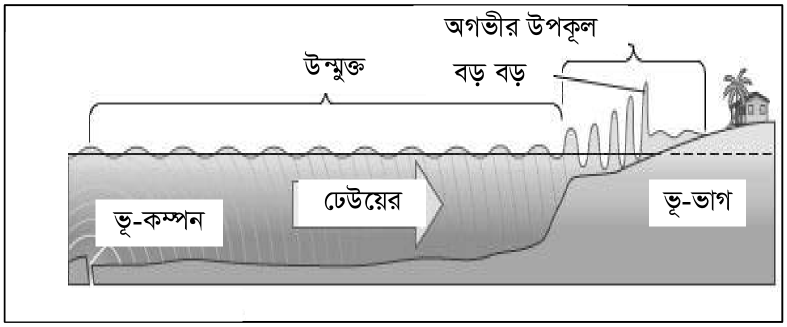

চিত্র ৩.৪.৫ : সুনামী এবং ওয়েভ ট্রেন

ক্রমাগত একের পর এক ঢেউ আসতে থাকায় সুনামী-কে **ওয়েভ ট্রেন (Wave Train)** বা **ঢেউ-এর রেলগাড়ি** নামেও অভিহিত করা হয়। ২০০৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে জাভা দ্বীপের নিকটবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট সমুদ্র

তলদেশীয় ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক সুনামী আঘাত হানে, যার ফলে মোট ১৪টি দেশে ব্যাপক প্রাণহানি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হয়।

ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলসমূহ ঃ

১. প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় আগ্নেয়গিরি বিশিষ্ট অঞ্চলসমূহ
২. মহাদেশীয় ঢালসমূহ,
৩. নবীন ও গঠনরত পর্বতমালা অঞ্চল,
৪. দুই মহাদেশ ও মহাসাগরের মিলনস্থল এবং
৫. পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল।

আগ্নেয়গিরির সংজ্ঞা (Definition of Volcano) : ভূ-গর্ভস্থ তাপ ও চাপের পরিবর্তনের ফলে ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত, ও গলিত বিভিন্ন পদার্থ, যেমন: উষ্ণ বাষ্প, গলিত শিলা, কাদা, ধাতু, ভষ্ম ইত্যাদি প্রবলবেগে ভূ-ত্বকের নীচের অংশে চাপ প্রয়োগ করে। এমতাবস্থায়, ভূ-ত্বকের দুর্বল স্থান বা ফাটল সমূহের ভিতর দিয়ে উক্ত পদার্থগুলো উৎক্ষিপ্ত হয়ে বহু দুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠের ঐ ছিদ্র পথ বা ফাটলের চারপাশে উক্ত পদার্থগুলো জমাট বেঁধে ক্রমশ উঁচু পর্বতের ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করে। এইরূপ পর্বতকে **আগ্নেয়গিরি** বলা হয়। আগ্নেয়গিরি থেকে যে পদার্থগুলো বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসে,তাকে **লাভা** (Lava) বলে। বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত এই পদার্থগুলো **ম্যাগমা** (Magma) নামে পরিচিত। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে বিশাল এলাকা জুড়ে ম্যাগমা, অর্থাৎ উত্তপ্ত ও গলিত শিলা, কাদা, ভষ্ম ও বাষ্প জমাকৃত হয়ে থাকে, যাকে ম্যাগমা চেম্বার বলা হয়। লাভা বের হবার মুখটিকে **জ্বালামুখ (Crater)** বলা হয়। যে পথে লাভা বের হয় সেটিকে **আগ্নেয় গ্রীবা** (Vent) বলা হয় (চিত্র ৩.৪.৬)।

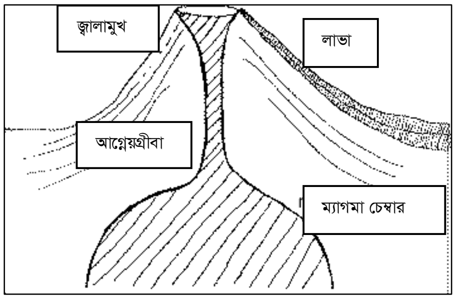

চিত্র ৩.৪.৬ : আগ্নেগিরির বিভিন্ন অংশ

আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি সমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:
ক. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active Volcano)
খ. সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano)
গ. মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct Volcano)

ক. **সক্রিয় আগ্নেয়গিরি** হলো সেই সব আগ্নেয়গিরি যেখান থেকে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দুই ধরনের। যেমন- যে সকল আগ্নেয়গিরি থেকে অবিরত লাভা নির্গত হয় সেগুলো **অবিরাম আগ্নেয়গিরি**। যেমন: ভূ-মধ্যসাগরের লিপারী দ্বীপের ষ্ট্রম্বলী আগ্নেয়গিরি।

অন্যদিকে যে সকল আগ্নেয়গিরি থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাকে **সবিরাম আগ্নেয়গিরি** বলে। যেমন: ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি।

খ. **সুপ্ত আগ্নেয়গিরি** সমূহ থেকে বহু বছর অগ্ন্যুৎপাত না হলেও যে কোনো সময়ে অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন : জাপানের ফুজিয়ামা।

গ. **মৃত আগ্নেয়গিরি**সমূহ থেকে পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা থাকে না। যেমন: পোপো আগ্নেয়গিরি। মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বৃষ্টির পানি জমে হ্রদ সৃষ্টি হলে, তাকে **আগ্নেয় হ্রদ** (Vent) বলে (চিত্র ৩.৪.৭)।

চিত্র ৩.৪.৭ : আগ্নেয় হ্রদ

অগ্ন্যুৎপাতের কারণ : যে সমস্ত কারণে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ভূ-ত্বক ফাটলের অবস্থান;
২. ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপ ও চাপ বৃদ্ধি;
৩. ভূ-গর্ভে তরল শিলার (ম্যাগমা) অবস্থান;
৪. ভূ-আন্দোলন ও
৫. ভূ-অভ্যন্তরে পানির প্রবেশ।

অগ্নুৎপাতের ফলাফল

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সুফল ও কুফল সমূহ নিম্নরূপ-

সুফলসমূহ

১. লাভা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। যেমন: ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় মালভূমি।

২. লাভা সঞ্চিত হয়ে নীচু স্থান ভরাট হয়ে সমতল স্থানে পরিণত হয়। যেমন : উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি।

৩. সমুদ্রগর্ভে লাভা জমে নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হয়। যেমন: প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।

৪. লাভার সাথে অনেক খনিজ পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত হয়।

৫. মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে হ্রদ সৃষ্টি হয়। যেমন: আলাস্কার মাউন্ট আডাকামা।

কুফলসমূহ

১. অগ্ন্যুৎপাত অনেক সময় ভূমিকম্প ঘটায়।

২. লাভা দ্বারা গ্রাম, শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়, যেমন: ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে পম্পেই নগর লাভার নীচে চাপা পড়ে।

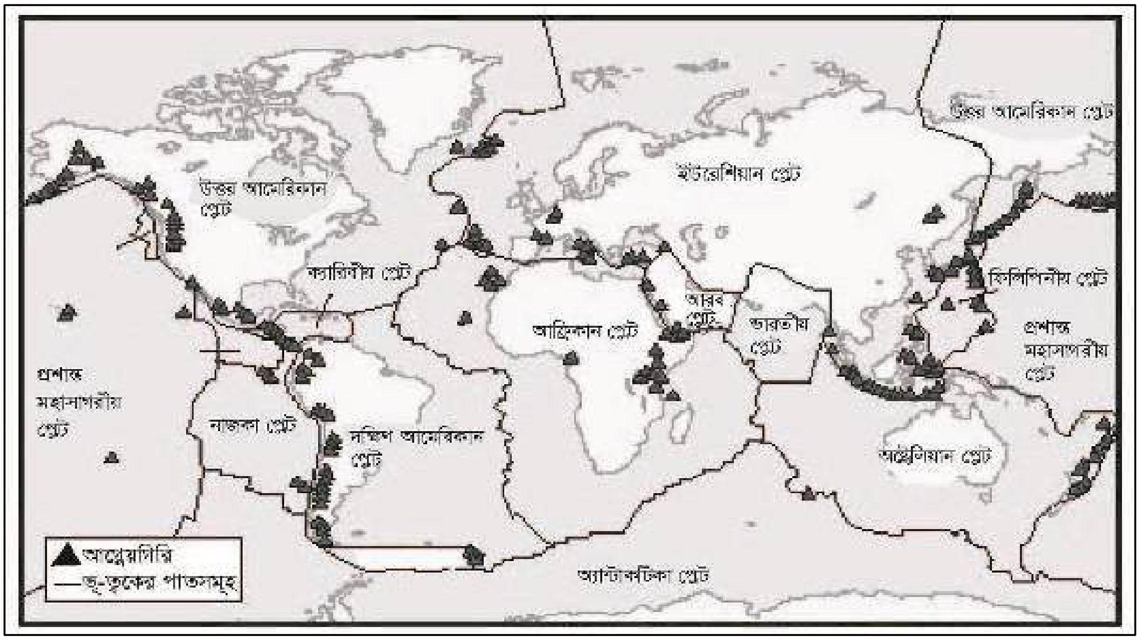

চিত্র ৩.৪.৮ ঃ আগ্নেয়গিরির অবস্থান মানচিত্র

৩. অগ্নুৎপাতের ফলে বড় গহ্বর সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- ১৮৮৩ সালে অগ্নুৎপাতের ফলে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী অংশে এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

আগ্নেয়গিরিসমূহের অবস্থান : পৃথিবীতে প্রায় ৫০০টির বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যার অধিকাংশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ও আশেপাশে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি মালার মত ঘিরে রয়েছে। এই মালা বা বলয়কে **'আগ্নেয় মেখলা' (Ring of Fire)** বলা হয়। চিত্র : ৩.৪.৮। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, ভাঁজ ও চ্যুতি জনিত ভূমিরূপ অঞ্চলসমূহে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বেশি। তবে হিমালয় পর্বত অঞ্চলে কোনো সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নেপালে ২০১৫ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পের স্থানটি মানচিত্রে চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ :

ভূ-গর্ভস্থ গলিত ও বাষ্পীয় পদার্থ সমূহ ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসাকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। অগ্নুৎপাতের ফলে নিঃসরিত লাভা জমাট বেঁধে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরি প্রধানত তিন প্রকার,যেমন: সক্রিয়, সুপ্ত ও মৃত। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সুফল-কুফল উভয়ই রয়েছে। পৃথিবী ৫০০ এর অধিক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ঘিরে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি রয়েছে যা মালার মত ঘিরে রয়েছে। একে 'আগ্নেয় মেখলা' বলে। আগ্নেয়গিরির সাথে ভূমিকম্পের সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূমিকম্পের উৎস স্থলকে কী বলা হয়?
(ক) কম্পকেন্দ্র (খ) উপকেন্দ্র (গ) ভূ-কম্পন তরঙ্গ (ঘ) ফাঁটল

২। ভূমিকম্প পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কী?
(ক) সেক্সটান্ট (খ) সিসমোমিটার (গ) থার্মোমিটার (ঘ) ক্রণোমিটার

৩। ভূ-ত্বকের প্লেট সমহে মোট কয়টি দিকে চলাচল করে?
(ক) ৪ দিকে (খ) ৩ দিকে (গ) ২ দিকে (ঘ) ১ দিকে

৪। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট বড় বড় ঢেউসমূহ কী নামে পরিচিত?
(ক) বন্যা (খ) জোয়ার (গ) সুনামি (ঘ) জলোচ্ছাস

৫। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গলিত পদার্থ সমূহকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
(ক) লাভা (খ) ম্যাগমা (গ) ভস্ম (ঘ) পলি

পাঠ-৩.৫ ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

(Slow Changes on Earth)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনে বায়ুর কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৃষ্টিপাতের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হিমবাহের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- নদীর কাজ ও নদীর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ক্ষয়ীভবন, শাখানদী, উপনদী, **'V'**-আকৃতির উপত্যকা, গিরিখাত, বদ্বীপ।

ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

আমরা পাঠ ৩.৪ এ ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই পাঠে আমরা ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবো। বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ ও নদীর প্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ বিচুর্ণীভবন, ক্ষয়ীভবন ও অবক্ষেপন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। যেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়ীভবনের মধ্য দিয়ে ধীর পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী ও হিমবাহ প্রভৃতি প্রধান। এদের ক্ষয়কার্য নিম্নে আলোচিত হলোঃ

বায়ুর কাজ : মরু এলাকার শুষ্ক, প্রায় বৃষ্টিহীন ও গাছপালা বিহীন হওয়ায় মৃত্তিকা সুদৃঢ় নয়। এছাড়া দিনের বেলায় সূর্যের তাপে এবং রাতের শীতলতায় শিলা ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে শিলার সংবদ্ধতা শিথিল হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় বায়ুপ্রবাহের আঘাতে এ অঞ্চলের শিলাসমূহ সহজেই অপসারিত ও বাহিত হয়ে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ক্ষয়সাধন করে। এছাড়া বায়ুস্থ অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার বিচ্ছেদ ও ক্ষয়সাধন করে (চিত্র ৩.৫.১)।

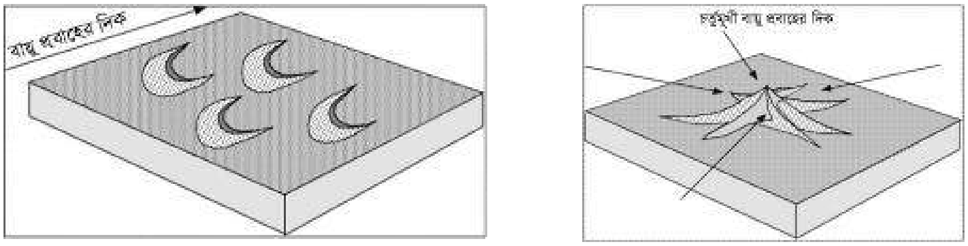

চিত্র ৩.৫.১ : বায়ু প্রবাহের দিক অনুসারে ভূমিরূপের বিভিন্নতা

চিত্র নং ৩.৫.২ : বৃষ্টির দ্বারা মৃত্তিকাপাত বা ভূমিধ্বস

বৃষ্টির কাজ : বৃষ্টির পানির প্রবাহের কারণে ভূ-পৃষ্ঠ ব্যাপকভাবে ক্ষয় হয়। প্রবাহিত বৃষ্টির পানি শিলাকে আংশিকভাবে ক্ষয় ও আলগা করে এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাকে অপসারিত করে। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে মৃত্তিকা বৃষ্টির পানির সাহায্যে ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হয়। পর্বতের ফাটল দিয়ে পানি প্রবেশ করে পর্বতের অভ্যন্তরস্থ নরম শিলাস্তরকে অর্ধগলিত করে তোলে। ফলে, উপরের স্তরসহ নিচের অর্ধগলিত কর্দমাক্ত স্তর নিচের দিকে ধসে পড়ে। একে মৃত্তিকা পাত বা ভূমিধ্বস বলে (চিত্র ৩.৫.২)।

হিমবাহের কাজ : হিমবাহ এর চলার পথে বাহিত শিলাখন্ডের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক ক্ষয়সাধন করে। পর্বতগাত্রে অবস্থিত ফাটল ও ছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করে রাত্রি বেলায় শীতল হয়ে বরফে পরিণত হয়। ফলে পর্বতগাত্রের শিলাসমূহ বিচূর্ণীত হয়ে প্রস্তরগুলোকে আলগা করে দেয়। ফলে হিমবাহের চাপে এটি পর্বতগাত্র থেকে খুব সহজেই

পৃথক হয়ে অন্যত্র বাহিত হয়ে যায়। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয় (চিত্র ৩.৫.৩)।

নদীর কাজ : ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনকারী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মধ্যে নদীপ্রবাহ অন্যতম। নদী তার প্রাথমিক গতিতে অত্যন্ত ক্ষরস্রোতা থাকে। পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময়ে নদী তার প্রবল স্রোতের আঘাতে কঠিন পর্বতগাত্রে ভি-আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টির পাশাপাশি বাহিত নুড়ি, কর্দম প্রভৃতির ঘর্ষণে নদীগর্ভে ও পার্শ্বদেশে ক্ষয় সাধন করে। মধ্যগতিতে সমভূমিতে প্রবেশ করলে নদীর ক্ষয়কার্য অপেক্ষা সঞ্চয় কার্য অধিক হয়ে থাকে। ক্ষয়কৃত নরম শিলা অবক্ষেপণ ও সঞ্চয়নের মাধ্যমে নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। এভাবে নদীপ্রবাহের সাহায্যে ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে ধীর পরিবর্তন সংঘটিত হয় (চিত্র ৩.৫.৪)।

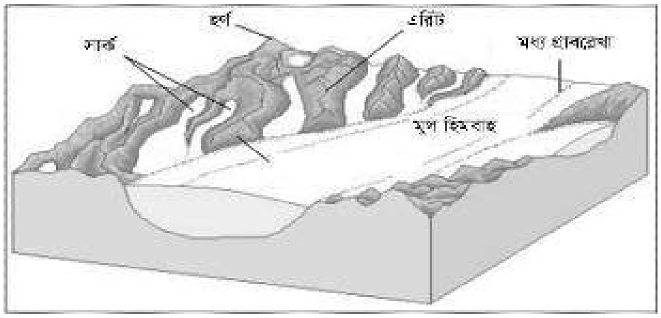

চিত্র ৩.৫.৩ : হিমবাহ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

নদীর সংজ্ঞা : পর্বত, মালভূমি বা অন্য কোনো উচ্চ স্থান থেকে বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাকে **নদী** বলে। যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় তাকে **নদীর উৎস** বলে। নদী যখন কোন হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে **মোহনা** বলে (চিত্র ৩.৫.৫)।

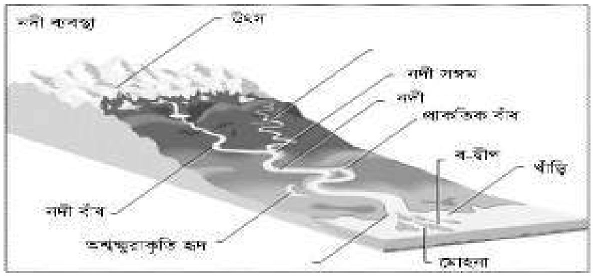

চিত্র ৩.৫.৪ : নদীর বিভিন্ন অংশে ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

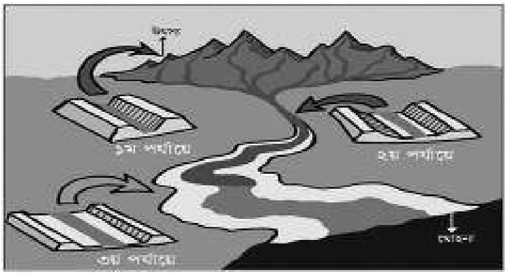

চিত্র ৩.৫.৫ : নদীর তিনটি পর্যায়ে নদী উপত্যকার আকার ও গভীরতা

নদীর বিভিন্ন অংশ ও গতিপথ

দোয়াব (Doab): **পাশাপাশি অবস্থিত** দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু পলল সমভূমি অঞ্চলকে **দোয়াব** বলে। যেমন: গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী **দোয়াব** অঞ্চল।

নদীসঙ্গম (River Confluence) : দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে **নদীসঙ্গম** বলে। যেমন: পদ্মা ও যমুনার মিলনস্থল গোয়ালন্দ উক্ত দুই নদীর **নদীসঙ্গম** অঞ্চল।

উপনদী (Tributary) : পর্বত বা হ্রদ থেকে ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হলে তাকে সেই বড় নদীর **উপনদী** বলে। বাংলাদেশের তিস্তা ও করতোয়া হলো যমুনা নদীর উপনদী।

শাখানদী (Distributary) : মূল নদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে **শাখানদী** বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই হলো পদ্মা নদীর শাখানদী।

নদী উপত্যকা (River Channel) : উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত যে খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত **নদী উপত্যকা** বলে (চিত্র ৩.৫.৪)।

নদীগর্ভ (River Bed) : নদী উপত্যকার তলদেশকে **নদীগর্ভ** বলে।

নদী অববাহিকা (River Basin) : উৎপত্তি স্থান থেকে শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে পতিত হয় সেই সমগ্র অঞ্চলকে **নদী অববাহিকা** বলে।

নদীর গতি পথ (Courses of a River)

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের আয়তন, গভীরতা, ঢাল, স্রোতের বেগ প্রভৃতির উপর ভিত্তিতে নদীর গতিপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৩.৫.৬)। যথা-

(ক) উর্ধ্বগতি (Upper Course)

(খ) মধ্যগতি (Middle Course)

(গ) নিম্নগতি (Lower Course)

(ক) উর্ধ্বগতি : প্রাথমিক অবস্থায় নদী উঁচু স্থানে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। উৎপত্তি স্থল থেকে আরম্ভ করে পর্বতের পাদদেশে অর্থাৎ সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর **উর্ধ্বগতি** বলে। উর্ধ্বগতিতে ক্ষয়সাধন নদীর প্রধান কাজ হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল কমে গেলে অথবা আকস্মিকভাবে অধিক পরিমাণে পাথরের টুকরা ভেসে এলে নদী তখন তা বহন করতে না পেরে পর্বতের পাদদেশে সঞ্চয় করে (চিত্র ৩.৫.৬)।

(খ) মধ্যগতি : পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে নদী সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে,তাকে নদীর **মধ্যগতি** বলে। মধ্যগতিতে নদী অনেক বেশি বিস্তৃত হলেও গভীরতা উর্ধ্বগতির তুলনায় অনেক কমে যায়। মধ্যগতিতে নদী প্রধানত সঞ্চয় করে থাকে। মধ্যগতিতে নদীর দুইদিকের নিম্নভূমি পলি দ্বারা ভরাট হয়ে প্রায় সমতলভূমিতে পরিণত হয়। একে প্লাবন সমভূমি বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি।

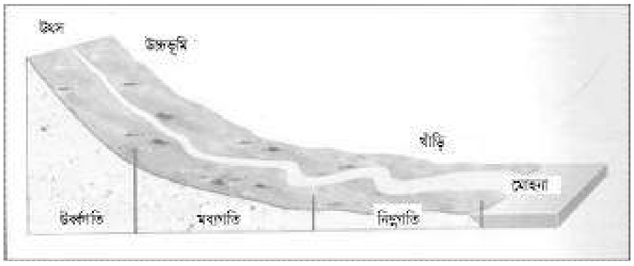

চিত্র ৩.৫.৬ : নদীর তিনটি গতিপথ

(গ) নিম্নগতি : নদী প্রবাহের শেষ পর্যায় হলো **নিম্নগতি**। এ অবস্থায় স্রোত একেবারে কমে গিয়ে নদী গর্ভের ক্ষয়কার্য প্রায় বন্ধ ও পার্শ্বক্ষয় অল্প পরিমাণে হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে নদী উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় পানিবাহিত বালুকণা, কাদা নদীগর্ভে ও সমুদ্র মোহনায় সঞ্চিত হয়।

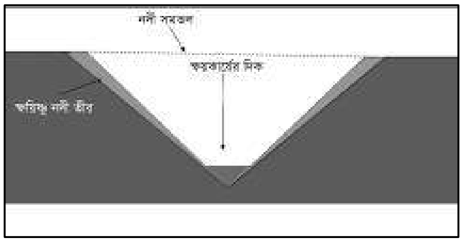
চিত্র ৩.৫.৭ : **'V'** আকৃতির উপত্যকা

নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

নদী দুইটি উপায়ে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। যেমন-ক) ক্ষয়কার্য ও খ) সঞ্চয়কার্য। নিম্নে নদীর ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বর্ণনা দেয়া হলো।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from River Erosion)

'V' আকৃতি উপত্যকা (V-Shaped Valley) : উর্ধ্বগতিতে নদী প্রবল স্রোতের আঘাতে বড় বড় শিলাখন্ড বহন করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকে ক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজী **'V'** আকৃতি হওয়ায় একে **'V'** আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৩.৫.৭)।

গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon)

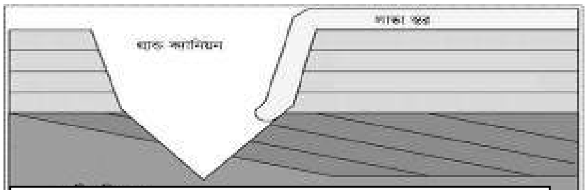
চিত্র ৩.৫.৮ : গিরিখাত

উর্ধ্বগতিতে নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয় হয়ে শিলাখন্ড ভেঙ্গে পড়ে। শিলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং নদীখাতের সঙ্গে সংঘর্ষে মসৃণ হয়ে অনেক দূর বাহিত হয়। এসব পাথরের সংঘর্ষে নদীর খাত আরও গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। এরূপ খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে (চিত্র ৩.৫.৮)।

সিন্ধু নদের গিরিখাতটি পৃথিবীর একটি অন্যতম গভীর গিরিখাত (৫১৮ মিটার)। নদী যখন শুষ্ক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয়। এরূপ

গিরিখাতকে **ক্যানিয়ন** বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরোডো নদীর গিরিখাত **গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন** (Grand Canyon) পৃথিবী বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার বিস্তৃত, প্রায় ২.৪ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

জলপ্রপাত (Waterfall) : নদীর উর্ধ্বগতিতে পানি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কোমল শিলাস্তরটি বেশি পরিমাণে ক্ষয় হয়। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। জলপ্রপাতের পানি নীচে যে স্থানে পতিত হয়, সেখানে ক্ষয় হয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়। একে **বর্তুলাকার গর্ত** (Pot-hole) বলা হয়। পানির এরূপ পতনকে **জলপ্রপাত বলে** (চিত্র ৩.৫.৯)। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।

চিত্র ৩.৫.৯ : জলপ্রপাত

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from River Deposition)

পলল কোণ ও পলল পাখা (Alluvial Cone and Alluvial Fan) : পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদী যখন সমভূমিতে প্রবেশ করে,তখন পর্বতের পাদদেশে শিলাচূর্ণ, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে প্রথমে ত্রিকোণ ও পরবর্তীতে হাতপাখার ন্যায় ভূ-খন্ডের সৃষ্টি হয়, যাকে যথাক্রমে পলল কোণ ও পলল পাখা বলে (চিত্র ৩.৫.১০)। যেসব অঞ্চলে মাটি অধিক পানি শোষণ করতে পারে সেসব অঞ্চলে পানি শোষণের ফলে শিলাচূর্ণ অধিক দূরত্বে যেতে পারে না এবং সেসব অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে **পলল কোণ** বলে। পানি বেশি শোষণ করতে না পারলে শিলাচূর্ণ বিস্তৃত হয়ে হাতপাখার ন্যায় ভূ-খন্ডের সৃষ্টি হয়। এরূপ পললভূমিকে **পলল পাখা** বলে। হিমালয়ের পাদদেশের গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীর গতিপথে এরূপ ভূ-খন্ড দেখতে পাওয়া যায়।

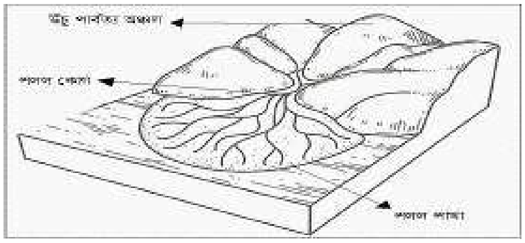

চিত্র ৩.৫.১০ : পলল কোণ ও পলল পাখা

পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain) : পাহাড়িয়া নদী পর্বত পাদদেশে পলি সঞ্চয় করতে করতে পাশাপাশি অনেকগুলো পলল পাখা তৈরি হয়। ফলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নতুন বিশাল সমভূমি গড়ে তোলে। এ ধরণের সমভূমিকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৫.১১)। বাংলাদেশের তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া সংলগ্ন রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পলল সমভূমি নামে পরিচিত। এসব নদী উত্তরের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে।
চিত্র ৩.৫.১১ ঃ পাদদেশীয় পলল সমভূমি

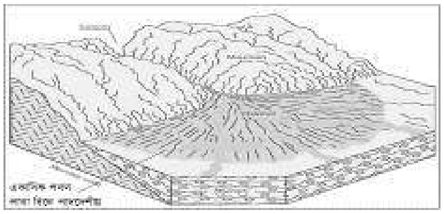
চিত্র ৩.৫.১১ ঃ পাদদেশীয় পলল সমভূমি

প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) : বর্ষাকালে নদীর উভয় কূল প্লাবিত হলে, তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দুইপাশের ভূমিতে পুরু কাদার স্তর ও পলি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে অনেকদিন পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমিতে সৃষ্টি হয়, তাকে প্লাবন সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৫.১২)। সমভূমি বলা হলেও এর কোথাও কোথাও সামান্য উঁচু নিঁচু দেখা যায়।

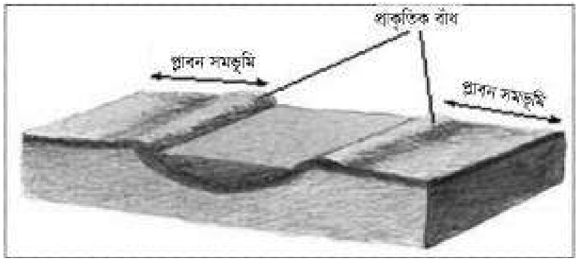

চিত্র ৩.৫.১২ ঃ প্লাবন সমভূমি

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পদ্মা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীবিধৌত প্লাবন সমভূমি। প্লাবন সমভূমির মধ্যে অনেক ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো- (ক) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ (খ) বালুচর (গ) প্রাকৃতিক বাঁধ ও (ঘ) ব-দ্বীপ। নিম্নে ব-দ্বীপ সম্পর্কে আলেচিনা করা হলো।

ব-দ্বীপ (Delta) : নদী মোহনায় পৌঁছলে স্রোতের বেগ একেবারেই কমে যায়। এরূপ অবস্থায় মোহনা অঞ্চলে পলি, বালি, কাদা ইত্যাদি তলানিরূপ সঞ্চিত হয়ে ভূ-ভাগের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চর ভূমিকে বেষ্টন করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোণাকার এই নতুন সমতলভূমিকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৩.৫.১৩)। এটি দেখতে মাত্রাহীন বাংলা **ব** এর মতো এবং গ্রিক শব্দ 'ডেল্টা'র মতো। তাই এর বাংলা নাম **ব-দ্বীপ** এবং ইংরেজী নাম **ডেলটা** হয়েছে। হুগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে মেঘনার সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সমস্ত দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিখ্যাত ব-দ্বীপ অঞ্চল।

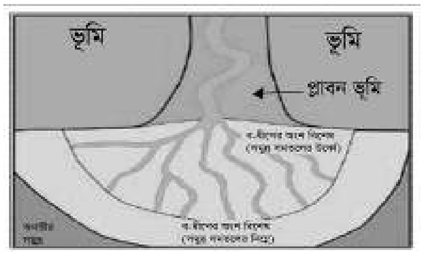

চিত্র ৩.৫.১৩ : ব-দ্বীপ

শিক্ষার্থীর কাজ	উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ :

পর্বত, মালভূমি বা অন্য কোনো উচ্চ স্থান থেকে বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তাকে **নদী** বলে। যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় তাকে **নদীর উৎস** বলে। নদী যখন কোন হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে **মোহনা** বলে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায় । যথা-(ক) উর্ধ্বগতি, (খ) মধ্যগতি ও (গ) নিম্নগতি । নদী দুইটি উপায়ে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। যেমন-ক)ক্ষয়কার্য ও খ)সঞ্চয়কার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতের শিলারাশি ধ্বসে নীচের দিকে নেমে এসে জমা হবার প্রক্রিয়াটি কী নামে অভিহিত?
(ক) হিমানি সম্প্রপাত (খ) মৃত্তিকা পাত (গ) বৃষ্টিপাত (ঘ) তুষারপাত

২. নদীর ক্ষয়কার্য কোন অবস্থায় সর্বাধিক পরিমাণে হয়ে থাকে?
(ক) প্রাথমিক অবস্থায় (খ) সমভূমিতে প্রবেশ কালে (গ) মধ্যগতিতে (ঘ) মোহনা মুখে

৩. পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু পলল সমভূমিতে অঞ্চলকে কী বলা হয়?
(ক) নদী সঙ্গম (খ) নদী উপত্যকা (গ) দোয়াব (ঘ) নদী গর্ভ

৪. অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর গিরিখাতকে কী বলা হয়?
(ক) বর্তুলাকার গর্ত (খ) জলপ্রপাত (গ) ক্যানিয়ন (ঘ) V-আকৃতির উপত্যকা

৫. পাহাড়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট কোণাকৃতির ভূমিরূপকে কী বলা হয়?
(ক) পাদদেশীয় পলল সমভূমি (খ) প্রাকৃতিক বাঁধ (গ) ব-দ্বীপ (ঘ) পলল কোণ

পাঠ-৩.৬ পর্বত (Mountain)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পর্বতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- পর্বতের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ভঙ্গিল পর্বত ,আগ্নেয় পর্বত, চ্যুতি-স্তূপ পর্বত, ল্যাকোলিথ পর্বত।

পর্বত

পৃথিবী পৃষ্ঠে উঁচু-নিচু বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপসমূহকে পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বলে। নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠের প্রধান ভূমিরূপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ (The Main Landforms of the Earth)

ভূ-পৃষ্ঠের নানা রকমের আকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যকেই ভূমিরূপ বলে। ভূ-পৃষ্ঠের রয়েছে উঁচু পর্বত, সমতল ভূমি, মালভূমি অথবা গভীর সমুদ্র। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা, বন্ধুরতা এবং ঢালের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- (১) পর্বত (২) মালভূমি (৩) সমভূমি। এই পাঠে পর্বত সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো।

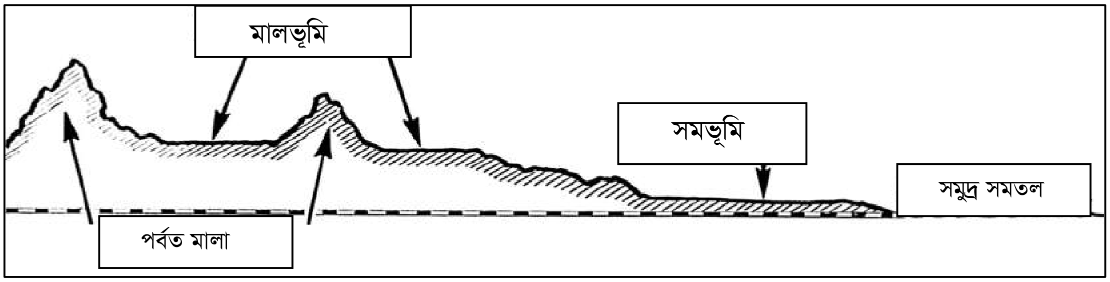

চিত্র ৩.৬.১ : পর্বত,মালভূমি,সমভূমি

পর্বত (Mountains)

সমুদ্র সমতল থেকে অন্তত ১,০০০ মিটার-এর অধিক উঁচু, সুবিস্তৃত, খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। অপর দিকে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬০০ থেকে ১,০০০ মিটার উঁচু, স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে। পর্বতের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর, ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়া বিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। যেমন- হিমালয় পর্বতমালা।

পর্বতের প্রকারভেদ (Classification of Mountains)

উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা-

(ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)

(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains)

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountains)

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)

(ক) ভঙ্গিল পর্বত : স্তরীভূত পাললিক শিলা পার্শ্ব ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে, তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ। সমুদ্র তলদেশের বিশাল অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি এসে জমা হয়। উপরের পলির চাপে অবনমিত স্থান আরও নিচে নেমে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখন্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে উর্ধ্বভাঁজ ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত উর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয় (চিত্র ৩.৬.২)।

চিত্র ৩.৬.২ : ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির ধাপ সমূহ

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর প্রধান দুইটি ভাঁজ পর্বত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে লিখুন।

(খ) আগ্নেয় পর্বত : ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে ফাটলের চারিদিকে জমাট বেঁধে উঁচু মোচাকৃতির (Conical) যে ভূমিরূপ তৈরি করে,তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয় (চিত্র ৩.৬.৩)। এটি সঞ্চয়জাত পর্বত নামেও পরিচিত। ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমানজারো, জাপানের ফুজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বত আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ।

চিত্র ৩.৬.৩ : আগ্নেয় পর্বত

চ্যুতি-স্তূপ পর্বত : ভূ-আলোড়নের সময় ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হলে ভূ-ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ফাটল বরাবর ভূ-ত্বকের উপরের শিলাসমূহ ক্রমে স্থানচ্যুত হয়,যা চ্যুতি নামে পরিচিত। ভূ-ত্বকের এ স্থানচ্যুতির ফলে একটি বিশাল শিলা খন্ড উপরে বা নিচের দিকে সরে যায়। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৩.৬.৪)। ভারতের বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

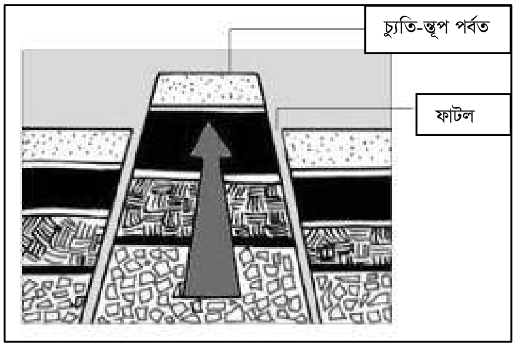

চিত্র ৩.৬.৪ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত : ভূ-অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন উপায়ে ভু-পৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম্যাগমা সমূহ বাধা পেয়ে ভূ-পৃষ্টের বাইরে না এসে ভূ-ত্বকের নিচে জমাট বেঁধে উর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূ-ত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট শৃঙ্গবিহীন সামান্য খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ও স্বল্প অঞ্চল ব্যাপী বিস্তৃত এই পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে (চিত্র ৩.৬.৫)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।

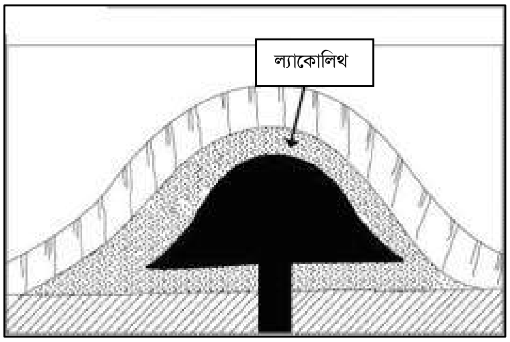

চিত্র ৩.৬.৫ : ল্যাকোলিথ পর্বত

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত ভঙ্গিল পর্বত সমূহ চিহ্নিত করে বিশ্ব মানচিত্র অংকন করুণ।

সারসংক্ষেপ :

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বলতে ভূ-পৃষ্ঠে উঁচু-নিচু বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপসমূহকে বুঝায়। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে (১) পর্বত (২) মালভূমি (৩) সমভূমি-এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই পাঠে পর্বত ও এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা- ভঙ্গিল পর্বত,আগ্নেয় পর্বত, চ্যুতি-স্তূপ পর্বত ও ল্যাকোলিথ পর্বত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবী পৃষ্ঠে উঁচু-নীচু বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপকে কী বলা হয় ?
(ক) পৃথিবীর অভ্যন্তরীন গঠন (খ) পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন
(গ) পৃথিবীর বায়ুমন্ডল (ঘ) পৃথিবীর বারিমন্ডল

২। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে কত ভাগে বিভক্ত করা হয় ?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩। হিমালয় পর্বত কোন শ্রেণির পর্বত?
(ক) ভঙ্গিল পর্বত (খ) আগ্নেয় পর্বত
(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (ঘ) ক্ষয়জাত পর্বত

৪। একটি বিশাল আকৃতির শিলাখন্ড স্থানচ্যুত হয়ে ও উঁচু হয়ে কোন ধরনের পর্বত সৃষ্টি করে?
(ক) চ্যুতি-স্তুপ পর্বত (খ) ভঙ্গিল পর্বত
(গ) ক্ষয়জাত পর্বত (ঘ) সঞ্চয়জাত পর্বত

৫। নিম্নের কোনটি ল্যাকোলিথ পর্বত শ্রেণির পর্বতের উদাহরণ?
(ক) হিমালয় পর্বত (খ) পিনাটুবো পর্বত
(গ) ব্ল্যাক ফরেষ্ট পর্বত (ঘ) হেনরী পর্বত

পাঠ-৩.৭ মালভূমি (Plateaus)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মালভূমির সংজ্ঞা জানবেন এবং
- মালভূমির শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, পাদদেশীয় মালভূমি, মহাদেশীয় মালভূমি।

মালভূমি

পর্বত থেকে কম উচ্চতার তবে সমভূমি থেকে অধিক উচ্চতার খাড়া ঢালযুক্ত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৭.১)। মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৪,৮৯০ মিটার। কলোরাডো মালভূমিতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও গভীর গিরিখাতটির নাম মিভানাও খাত।

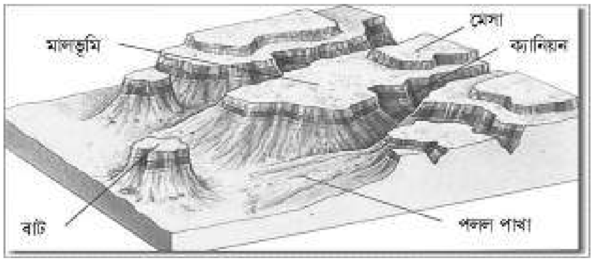

চিত্র ৩.৭.১: মালভূমি ও এর সংলগ্ন অন্যান্য ভূমিরূপ

অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন ধরনের। যথা- (ক) পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি (খ) পাদদেশীয় মালভূমি (গ) মহাদেশীয় মালভূমি ।

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি : পর্বতের মধ্যখানে এই প্রকারের মালভূমি দেখতে পাওয়া যায়। এই মালভূমির উচ্চতা প্রায় ৩,০০০ থেকে ৪,৫০০ মিটার হয়ে থাকে। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি। এই পর্বতের উত্তরে কুনলুন ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বত এবং পূর্ব-পশ্চিমের অন্যান্য পর্বত ঘিরে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া এ ধরনের মালভূমি।

চিত্র ৩.৭.২: পাদদেশীয় মালভূমি

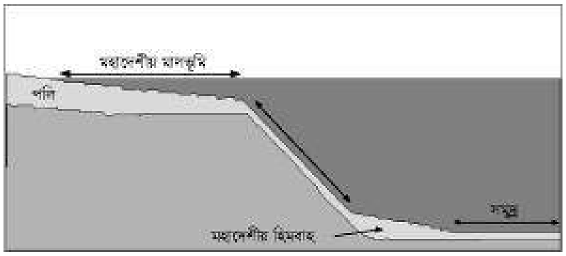

চিত্র ৩.৭.৩: মহাদেশীয় মালভূমি

(খ) পাদদেশীয় মালভূমি : উঁচু পর্বত থেকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলারাশি এর পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে, যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি (চিত্র ৩.৭.২)।

(গ) মহাদেশীয় মালভূমি : সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, গ্রিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ এর অন্যতম উদাহরণ (চিত্র ৩.৭.৩)।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্ব মানচিত্রে তিব্বত মালভূমি, পামীর মালভূমি ও দক্ষিণাত্যের মালভূমি চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ :

পর্বত থেকে কম উচ্চতার তবে সমভূমি থেকে অধিক উচ্চতার খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে। অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন ধরনের। যথা- (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি (খ) পাদদেশীয় মালভূমি (গ) মহাদেশীয় মালভূমি। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি। পর্বতের মধ্যখানে এই প্রকারের মালভূমি দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি। সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। ভারতীয় উপদ্বীপ এর অন্যতম উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পর্বত থেকে কম উচ্চতা বিশিষ্ট খাড়া, উঁচু সমতল ভূমিকে কী বলা হয়?

(ক) হ্রদ (খ) সমভূমি

(গ) পর্বত (ঘ) মালভূমি

২। তিব্বত মালভূমি কোন শ্রেনীর মালভূমি?

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি (খ) পাদদেশীয় মালভূমি

(গ) ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (ঘ) মহাদেশীয় মালভূমি

৩। পাদদেশীয় মালভূমি কোন অবস্থায় সৃষ্টি হয়?

(ক) ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময়ে (খ) পর্বতে ক্ষয়কার্যের ফলে জমাকৃত শিলার দ্বারা

(গ) ভূ-আন্দোলনের ফলে উঁচু হয়ে (ঘ) লাভা সঞ্চিত হয়ে

৪। কলোরাডো মালভূমিতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও গভীর গিরিখাতটির নাম কী?

(ক) মারিয়ানা খাত (খ) মিন্ডানাও খাত

(গ) গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (ঘ) ডাউকি ফল্ট

পাঠ-৩.৮ সমভূমি (Planis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমভূমির সংজ্ঞা জানতে পারবেন এবং
- সমভূমির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	সমভূমি, ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

সমভূমি

সমুদ্রপৃষ্ট থেকে স্বল্প উচ্চতায় মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন- নদীপ্রবাহ, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসতি নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। বিশ্বে সমভূমি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা ঘণ জনবসতি গড়ে উঠেছে। উৎপত্তির ধরনের ভিত্তিতে সমভূমিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional Plains) : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন-নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোনো উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, নীচু হয়ে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। অ্যাপালেশিয়ান পাদদেশীয়

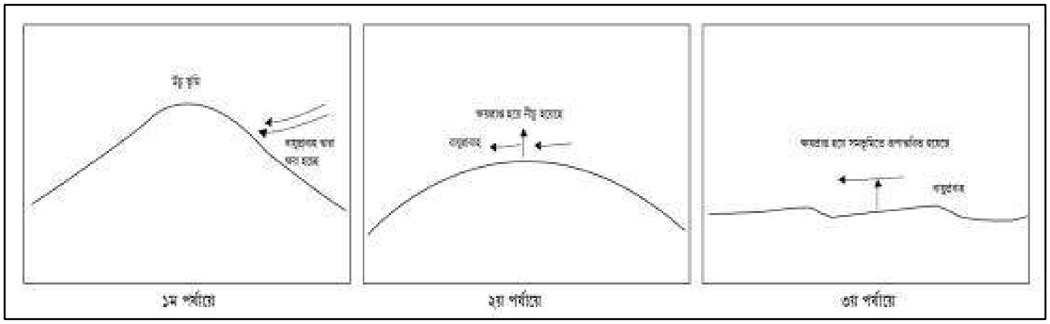

চিত্র ৩.৮.১: ক্ষয়জাত সমভূমি সৃষ্টির পর্যায় সমূহ

সমভূমি, ফিনল্যান্ড ও সাইবেরিয়া সমভূমি এ ধরনের ক্ষয়জাত সমভূমি। বাংলাদেশের মধুপুরের চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি দুটি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional Plains) : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহ এবং বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পলি, বালুকণা, ধূলিকণা বাহিত হয়ে নিম্ন অঞ্চলসমূহে সঞ্চিত হতে থাকে। এরূপে সঞ্চিত হতে হতে কালক্রমে যে সমভূমি সৃষ্টি হয়, তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। যেমন- নদীর পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে সৃষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব-দ্বীপ, শীতপ্রধান এলাকায় হিমবাহের গ্রাবরেখা দ্বারা সঞ্চয়কৃত পলি থেকে গড়ে ওঠা হিমবাহ সমভূমি।

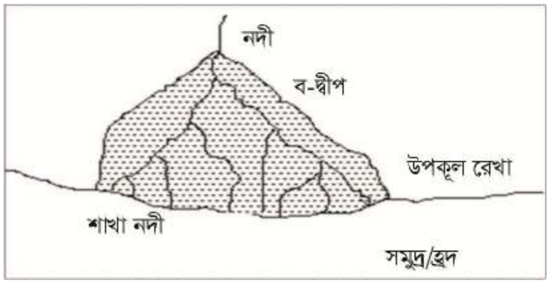

চিত্র ৩.৮.২: নদী মোহনায় সৃষ্ট ব-দ্বীপ

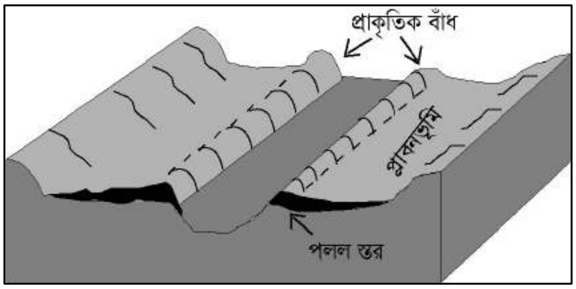

চিত্র ৩.৮.৩: প্লাবন সমভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্বে সমভূমি অঞ্চলসমূহ কেন সর্বাপেক্ষা ঘণ জনবসতি গড়ে উঠেছে? আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে স্বল্প উচ্চতায় মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন- নদীপ্রবাহ, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোনো উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নীচু হয়ে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। অ্যাপালেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি একটি ক্ষয়জাত সমভূমি। প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহ এবং বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পলি, বালুকণা ও ধূলিকণা বাহিত হয়ে নিম্ন অঞ্চল সমূহে সঞ্চিত হতে থাকে। এরূপে সঞ্চিত হতে হতে কালক্রমে যে সমভূমি সৃষ্টি হয়, তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সমুদ্র সমতল থেকে স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমিরূপকে কী বলা হয়?
   (ক) সমভূমি (খ) মালভূমি (গ) পর্বত (ঘ) সমুদ্র

২. নদী প্রবাহের কোন অবস্থায় ব-দ্বীপ গঠিত হয়?
   (ক) উৎস মুখে (খ) মধ্যবর্তী অবস্থায় (গ) সমভূমিতে (ঘ) মোহনা মুখে

চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

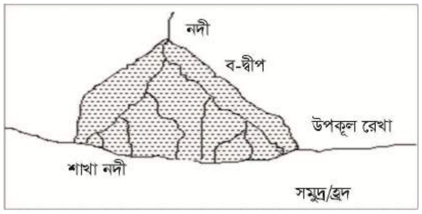

চিত্র ১

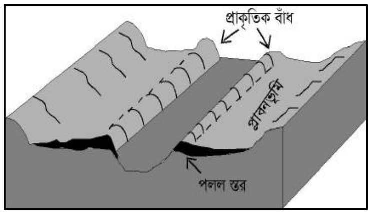

চিত্র ২

৩. চিত্র ১-এর ভূমিরূপ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে দেখা যায়?
   (ক) সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে (খ) পার্বত্য অঞ্চলে
   (গ) সিলেটের টিলা অঞ্চলে (ঘ) মধুপুর গড় অঞ্চলে

৪. চিত্র ১ ও চিত্র ২ উভয়ের ভূমি গঠিত হয়-
   (ক) পলি সঞ্চয়নের ফলে (খ) লাভা সঞ্চয়নের মাধ্যমে
   (গ) চ্যুতির ফলে (ঘ) ভূমিকম্পের ফলে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল নেপালে গেলেন। সেখানে অবস্থান কালে তারা বড় ধরনের ভূমিকম্পের কবলে পড়েন। ফলে খেলা বাতিল করে দেশে ফিরে আসেন।

ক. আকস্মিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়?

খ. ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কেন প্রচার করা হয় না?

গ. নেপালের উত্তরে কোন পর্বতের পাদদেশে ভূমিকম্প হয় ও কেন?

ঘ. ভূমিকম্পে বাংলাদেশের জনগণের করণীয় সম্পর্কে লিখুন।

১ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ক. স্বল্প সময়ের জন্য, অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিস্তৃত স্থান জুড়ে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া বলা হয়।

খ. ভূ-ত্বক প্লেটসমূহ বিভিন্ন দিকে চলাচল, ভূ-গর্ভস্থ তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, ভূ-অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিলারাশির মধ্যে টান সৃষ্টি, আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত , শিলাচ্যুতি ও হিমবাহের চলাচল, ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে।

গ. নেপালের উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ সালে,৭.৮ রিখটার স্কেলের এক ভুমিকম্প সংঘটিত হয়। ভূ-ত্বকের দুইটি প্লেটের মুখোমুখী চলাচলের ফলে এই ভুমিকম্প সংঘটিত হয়।

ঘ. ভূমিকম্পে বাংলাদেশের জনগণের করণীয় হলো:

- ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন হওয়া যেমন-পাঠ্যবই ও জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা পত্রে ভূমিকম্প সম্পর্কে জানানো,
- ভূমিকম্প প্রতিরোধ যোগ্য ইমারত ও স্থাপনা নির্মাণ নিশ্চিত করা,
- ভূমিকম্পের সময়ে নিরাপদ স্থানে যাবার উপায় সমূহ জানা,
- ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহকে উদ্ধার কার্য পারচালনায় সহায়তা করা ও
- ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজ এলাকায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পুর্ণবাসন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।

উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন : ২

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন ও নিচের প্রশ্নের উত্তরসমূহ লিখুন।

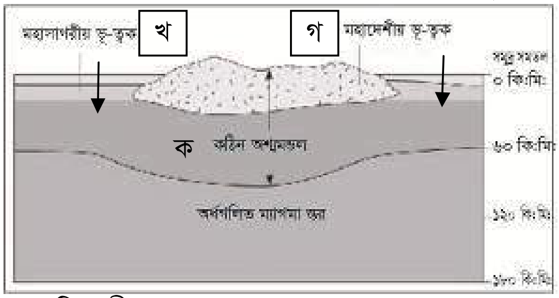

ক. খনিজ কী?

খ. পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় কেন ? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উপরের চিত্রে **‘ক’** চিহ্নিত স্তরের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উপরের চিত্রে **‘খ’** ও **‘গ’** স্তরের গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে কী? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.১: ১. (খ) ২.(ক) ৩. (ক) মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক (খ) মহাদেশীয় ভূ-ত্বক (গ) কঠিন অশ্মমন্ডল (ঘ) অর্ধগলিত ম্যাগমা স্তর, ৪.(খ) ৫.(খ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.২: ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (গ) ৫. (গ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৩: ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (ঘ) ৫. (খ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৪ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (খ) ৪. (গ) ৫. (ক)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৫ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (গ) ৫. (ঘ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৬ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (ক) ৫. (ঘ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৭ ১. (ঘ) ২. (ক) ৩. (খ) ৪. (গ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৮ : ১. (ক) ২. (ঘ) ৩. (ক) ৪. (ক)